ধর্মে বিজ্ঞানঃ নিম গাছে আমের সন্ধান

নাস্তিকের ধর্মকথা

শুরু করছি একটি পৌরানিক কাহিনী দিয়ে, মহাভারতে এটি পাওয়া যাবে, ভাগবতেও এ কাহিনী আছে। দেবতাকূল সমুদ্র মন্থনের মাধ্যমে অমৃত আহরণ করে যখন তা পান করতে যাবে, সে সময় দানবদের মধ্য থেকে একজন, নাম রাহু, দেবতা সাজে সেখানে উপস্থিত হয়ে দেবতাদের সাথে অমৃত পান আরম্ভ করে। কিন্তু দেবতা সূর্য এবং চন্দ্র হঠাৎই রাহুকে চিনতে পারায় তারা দেবতাদের জানিয়ে দেয় এবং দেবরাজ ইন্দ্র এককোপে রাহুর মস্তক ছিন্ন করে ফেলে। ঠিক সেই মুহূর্তে রাহু কর্তৃক পানকৃত অমৃত কেবল মস্তক হতে গলা পর্যন্ত এসেছিল বিধায় মস্তক পর্যন্ত অংশটুকু অমর হয়ে যায় এবং আকাশের একস্থানে অবস্থান করতে থাকে। সূর্য এবং চন্দ্রের কারণে ধরা পড়ে যাওয়ার কারণে তাদের প্রতি শুরু হয় ভীষণ শত্রুতা এবং যখনই তাদের সঞ্চারপথে রাহুর নাগালের মধ্যে আসে, তখনই রাহু সূর্য ও চন্দ্রকে গিলে খায়। যেহেতু রাহুর শুধু মস্তকই আছে, ফলে সে সূর্য-চন্দ্রকে হজম করতে পারে না বরং কিছুক্ষণের মধ্যেই তার কাটা গলা দিয়ে বের হয়ে পড়ে। যেসময়টুকু তার মুখের মধ্যে থাকে সে সময়েই হয় সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ।

বিভিন্ন জায়গার উপকথা, পুরাণ, প্রাচীণ গাঁথায় এরকম অসংখ্য কাহিনী আমরা পাই, যেখানে আমাদের চারপাশের প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনার ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এগুলো, পড়লে আমরা বুঝতে পারি- এককালে মানুষ কিকরে বিভিন্ন ঘটনার উত্তর কল্পনা করেছে। কিন্তু সমস্যা হয় তখনই যখন মানুষ এসব নানা কাহিনীকে স্ব স্ব ধর্মের মোড়কে অন্ধভাবে বিশ্বাস করা আরম্ভ করে এবং তার একটা সার্বজনীন রূপ দেয়ার চেষ্টা করে। আর এই সার্বজনীন রূপ দিতে গিয়ে আজকের বিজ্ঞানের যুগে এসে, বিজ্ঞানের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যার সাথে সেইসব পৌরানিক কাহিনীর একটা যোগসূত্র বের করে ফেলে অনেকেই। উপরের ঘটনাটির একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেখেছিলাম তেমনি একটি আলোচনায়। সেটি একটু শুনেনঃ

ভাগবতে আছে, "*রাহুর মস্তক অমৃতের স্পর্শ লাভ করিবার ফলে অমর হইয়াছিল। তাই ব্রহ্মা রাহুর মস্তককে একটি ছায়া গ্রহরূপে স্বীকৃতি দিয়াছিলেন। রাহু যেহেতু চন্দ্র এবং সূর্যের চিরশত্রু, তাই অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্র ও সূর্যের প্রতি ধাবিত হয়*"। (**ভাঃ ৮/৯/২৬**), কিংবা "*রাহু সূর্য এবং চন্দ্র উভয়ের প্রতিই বৈরীভাবাপন্ন এবং তাই সে প্রত্যেক অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে তাহাদের আচ্ছাদিত করতে চেষ্টা করে*"। (**ভাঃ ৫/২৪/২**)

এই আলোচনার পরেই সেখানে আনা হলো চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সম্পর্কিত বিজ্ঞানের আলোচনা এবং দুটিতে অদ্ভুতভাবে মিল দেখিয়ে দাবী করা হলো, রাহু হলো ছায়া যা চন্দ্রের উপরে পড়ে, সব পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রগ্রহণ হয় না- সব অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণ হয় না, কেবল যখন রাহু বা ছায়া পড়ে তখনই এই গ্রহণ হয়। অতএব বিজ্ঞানের সমস্ত ব্যাখ্যা ভাগবতেই বিদ্যমান!

ধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাঃ

এই যে, ধর্মের মধ্যে বিজ্ঞানকে খুঁজে বের করা- ধর্মের বিভিন্ন ঘটনা-ব্যাখ্যা-আলোচনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দাঁড় করানো, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারকে ধর্মের প্রাচীণ গ্রন্থের মাঝে খুঁজে পাওয়া এসবের উদ্দেশ্য জানতে বেশী চিন্তা করতে হয় না। যে সময়ে ধর্মসমূহের উদ্ভব, সে সময়টি বা যুগটি মানুষ পার হয়ে এসেছে অনেক আগেই। একসময় কোপার্নিকাস-ব্রুনো-গ্যালিলিও-হাইপেশিয়াদের মেরে, লাইব্রেরী পুড়িয়ে, পেশী শক্তি দিয়ে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা সাময়িক স্তব্ধ করা গেলেও, মানুষকে পুরোপুরি আটকে রাখা সম্ভব হয়নি। এখন এই যুগে যখন মানুষের জ্ঞানজগতে বিচরণ হাজার বছর আগের কুসংস্কারকে অগ্রাহ্য করতে চায় বারেবারে। আর উল্টোদিকে প্রতিটি ধর্মই যে শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিয়ে এসেছিল, তা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। একে টিকিয়ে রাখতে তাই আজকের বিজ্ঞানের সাথে একটা ব্লেণ্ডিং যাকে বলে মিলে-মিশে জগা-খিচুরী বানানোটা হয়ে ওঠে অপরিহার্য। এভাবে ধর্মসমূহ হয়ে ওঠে বিজ্ঞানময়, ধর্মগ্রন্থ হয়ে ওঠে সায়েন্স এনসাইক্লোপিডিয়া!!

কিছু নমুনা দেখিঃ

কোরানঃ "অতঃপর আমি নিদর্শন দিতেছি। ওই সকল তারকার যাহারা পিছনে হটিয়া যায়।" - ৮১:১৫

বিজ্ঞানঃ অন্যান্য সকল দরবর্তী গ্যালাক্সী আমাদের এই মিলকীওয়ে গ্যালাক্সি থেকে সর্বদা দুরে সরে যাচ্ছে। ১৯২০ এর দশকে বৈজ্ঞানিক এডুইন হাবল দূরবর্তী গ্যালাক্সিসমূহের তারকার আলো পর্যবেক্ষন করে দেখতে পান- সেগুলি সর্বদা পশ্চাদপসরণ করছে।

কোরানঃ "আকাশমন্ডলীকে আমিই সৃষ্টি করিয়াছি শক্তিদ্বারা এবং নিশ্চই আমি উহাকে সম্প্রসারিত করিতেছি।"-৫১:৪৭

বিজ্ঞানঃ সকল দিকের সব দূরবর্তী গ্যালাক্সিই প্রতিনিয়ত আমাদের মিলকীওয়ে গ্যালাক্সী থেকে দুরে সরে যাচ্ছে। এর অর্থ দাড়ায়, মহাবিশ্ব সর্বদাই সম্পসারিত হচ্ছে।

কোরানঃ "কাফিরেরা কি দেখে না যে, এই আসমান যমীন সবকিছু মিলিত অবস্থায় ছিল, পরে আমি এইগুলিকে আলাদা আলাদা করিয়া দিয়াছি।"- ২১:৩০

বিজ্ঞানঃ মহাবিশ্ব বর্তমানে সম্প্রসারিত হচ্ছে, যার অর্থ দাড়ায়, আদিতে কোন এক সময় মহাবিশ্বের সমস্ত গ্রহ, নক্ষত্র তথা সমস্ত পদার্থ একত্রিত অবস্থায় ছিল, সম্ভবত কোন এক আদি বিস্ফোরণ থেকে এই সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছে। (বিগব্যাঙ)

কোরানঃ "ত৹পর তিনি আসমানের প্রতি মন দিলেন, তখন উহা ধোঁয়া ছিল, পরে তিনি আসমান ও যমীনকে বলিলেন, 'আস, ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায়', তাহারা বলিল, 'আমরা একান্ত অনুগতভাবেই আসিলাম।'" - ৪১:১১

বিজ্ঞানঃ সৃষ্টির প্রারম্ভে মূলত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসের মিশ্রিত ধোয়া উৎপন্ন হয়েছিল। কোন এক কারণে এই ধোয়া বিভক্ত হয়ে বিশাল আকৃতির সব ধোয়ার মেঘে রূপান্তরিত হয়েছিল। পরবর্তিতে এক একটি ধোয়ার মেঘ রূপান্তরিত হয়েছে এক একটি গ্যালাক্সিতে। ধোয়া থেকেই সৃষ্টি হয়েছে এ মহাবিশ্ব সব গ্যালাক্সি তথা সম্পূর্ন মহাবিশ্ব।

কোরানঃ সূর্য তার নিজ অক্ষে ঘুরিতেছে। ইহা পরাক্রমশালী প্রভুর নির্ধারিত। আমি চন্দ্রকে যথাস্থানে বসিয়ে দিয়েছি এমনকি চন্দ্রটি শীর্ণ খেজুর পাতার মতো হয়ে যায়। সূর্য চন্দ্রকে ধরতে পারে না ও রাত্রিও দিনকে আতিক্রম করতে পারে না। তারা নিজ নিজ কক্ষ পথে চলতেছে। (৩৬: ৩৮, ৩৯, ৪০)

বিজ্ঞানঃ সূর্য তার নিজ অক্ষে ঘুরছে...স্থির ভাবে। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষ পথে ঘুরছে... বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল.. সবার কক্ষপথ আলাদা। সূর্য এদের মাঝখানে।

কোরানঃ হে জ্বিন ও মানবমণ্ডলী, যদি তোমরা প্রবেশ করিতে পার আসমান ও জমিনের এলাকায়, তাহা হইলে উহাতে প্রবেশ কর৷ তোমরা উহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না মহাবমতা ব্যতিরেকে। (৫৫:৩৩)

বিজ্ঞানঃ আবার মহাশূন্য বিজয়ের কথাও কোরআন শরীফের ৫৫নং সুরার ৩৩নং আয়াতে ইঙ্গিত দেয়া আছে৷ অর্থা৷ আল্লাহ বলছেন, তোমরা মহাৰমতা অর্জন করেই কেবল উহাতে প্রবেশ করতে পারবে৷ বলাবাহুল্য, এই মহাৰমতা হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে মহাকর্ষের বাধা অতিক্রমকারী দ্রম্নতগামী প্রযুক্তি অর্জন৷ বিগত শতকের শেষ দিকে মানুষ এই প্রযুক্তি করায়ত্ত করে এবং সফলভাবে চাঁদে অবতরণ করে৷

একটু দেখলেই বুঝা যায় এরকম **বিজ্ঞানীকিকরণের** ক্ষেত্রে দুটি কাজ সচেতনভাবে করা হয়, দুধরণের বিচ্যুতি, বিজ্ঞানের কোন স্বীকৃত তথ্যক কোরানজাত করতে গিয়ে প্রথম বিচ্যুতি ঘটানো হয় অনুবাদে ও দ্বিতীয় বিচ্যুতিটি ঘটে ব্যাখ্যায়। যেমন,

অনুবাদগত বিচ্যুতিঃ উপরের নমুনা থেকে দেখি, ৮১:১৫ ও ১৬ এর অনুবাদ করাঝয়েছে এভাবে: "অতঃপর আমি নিদর্শন দিতেছি। ওই সকল তারকার যাহারা পিছনে হটিয়া যায়"। জহুরুল হকের অনুবাদে আমরা পাই, "আমি স্বাক্ষী মানছি গ্রহ-নক্ষত্রদের। যারা চলে থাকে, অদৃশ্য হয়ে যায়"। আরো তিনটি অনুবাদ দেখি:

"YUSUFALI: So verily I call to witness the planets - that recede, Go straight, or hide; PICKTHAL: Oh, but I call to witness the planets, The stars which rise and set, SHAKIR: But nay! I swear by the stars, That run their course (and) hide themselves,"

একইভাবে, ৫১:৪৭ এর অনুবাদ করা হয়েছে, "আকাশমন্ডলীকে আমিই সৃষ্টি করিয়াছি শক্তিদ্বারা এবং নিশ্চই আমি উহাকে সম্প্রসারিত করিতেছি"। জহুরুল হকের অনুবাদে এটি অনেকটা এমন : "আর মহাকাশমণ্ডল, আমরা তা নির্মাণ করেছি হাতে, আর আমরাই বিশালতার নির্মাতা"। ইংরেজী অনুবাদে পাই:

"YUSUFALI: With power and skill did We construct the Firmament: for it is We Who create the vastness of pace.
PICKTHAL: We have built the heaven with might, and We it is Who make the vast extent (thereof).
SHAKIR: And the heaven, We raised it high with power, and most surely We are the makers of things ample. "

এরপরে আসি সূর্য ও পৃথিবীর গতিসংক্রান্ত আয়াতের অনুবাদে। ৩৬:৩৮ এর অনুবাদে এখানে বলা হয়েছে, "সূর্য তার নিজ অক্ষে ঘুরিতেছে"। জহুরুল হকের অনুবাদ: "সূর্য তার গন্তব্যপথে বিচরণ করে"। এবং ইংরেজী অনুবাদে পাই:

"YUSUFALI: And the sun runs his course for a period determined for him:
PICKTHAL: And the sun runneth on unto a resting-place for him.
SHAKIR: And the sun runs on to a term appointed for it; "

এরকম আরো দেখানো যেতে পারে, আশা করি আপনার নিজেও কয়েকটি অনুবাদের সাথে মিলিয়ে দেখলেই বুঝবেন।

ব্যাখ্যাগত বিচ্যুতিঃ এখানে আরো মজা, কেননা সবচেয়ে বড় জোচ্চুরী ঘটে এখানেই। "গ্রহ-নক্ষত্ররা চলে ও অদৃশ্য হয়" (৮১:১৫) এই অনুবাদের বদলে "তারারা পিছু হটে" এই অনুবাদ ধরলেও যখন এর সাথে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি থেকে অন্য গ্যালাক্সিসমূহ দূরে সরে যাচ্ছে বিজ্ঞানী হাবলের এই আবিষ্কারের যোগসূত্র বের করা হয়, তখন হাসবো না কাঁদবো বুঝতে পারি না। আবার যখন "সূর্য চন্দ্রকে ধরতে পারে না ও রাত্রিও দিনকে আতিক্রম করতে পারে না। তারা নিজ নিজ কক্ষ পথে চলতেছে" (৩৬:৪০) এর ব্যাখ্যায় বলা হয় তারা মানে পৃথিবী, গ্রহ সমূহ নিজ নিজ অক্ষে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, তখন ব্যকরণ নতুন করে শিখতে ইচ্ছে করে। প্রশ্ন এসে খেলা করে, বিশেষ্যের পরে যে সর্বনাম বসে, সেই সর্বনাম কোন বিশেষ্যের স্থানে বসে! "আসমান যমীন সবকিছু মিলিত অবস্থায় ছিল, পরে আমি এইগুলিকে আলাদা আলাদা করিয়া দিয়াছি" (২১:৩০) এর ব্যাখ্যায় যখন বিগব্যাঙ থিওরি খুঁজে পাওয়া যায়, তখন মনে আসে এখন না থাক সৃষ্টির আদিতে নিশ্চয় আসমান বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নিশ্চয় ছিল। আরেকবার বিগব্যাঙ থিওরি খুঁজে দেখি শুরুতেই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল কি-না। "হে জ্বিন ও মানবমণ্ডলী, যদি তোমরা প্রবেশ করিতে পার আসমান ও জমিনের এলাকায়, তাহা হইলে উহাতে প্রবেশ কর" (৫৫:৩৩) এর ব্যাখ্যায় যখন বলা হয় মানুষের চন্দ্রে অভিযান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী কোরানেই করা হয়েছে, তখন আর হাসি চেপে রাখতে পারি না, মনে পড়ে যায়

সেই গল্পের কথা, যেখানে অর্ধশিক্ষিত এক গ্রাম্য যুবক বকলম গ্রামবাসীদের নিজের মত টেলিগ্রাম অনুবাদ করে শুনিয়েছিল!!

বিজ্ঞান বনাম কোরানঃ

মজা এখানেই শেষ নয়। আরেকটি মজার ব্যাপার হলো, এ ধরণের বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনায় আড়ালে আবডালে থেকে যায় কোরান- হাদীসের আরো কিছু সুরা, আয়াত, হাদীস। একইভাবে সেখানে ঘুণাক্ষরেও আনা হয় না বিজ্ঞানের অন্য কিছু স্বীকৃত আবিষ্কারের কথা। আর কোনক্রমেই যদিবা এসব কেউ নিয়েও আসে, সাথে সাথে ফতোয়াও হাজির হয়ে যায়ঃ "**এসব কোরান-হাদীস বুঝার সামর্থ্য আমাদের মত অর্বাচীনের নেই, কোন কোনটি আবার নাকি বিয়োণ্ড হিউম্যান ইমাজিনেশন**", কিংবা আক্রমণ চলে আসে বিজ্ঞানের উপরেই: "**বিজ্ঞান কি সব কিছু কখনো জানতে পারে?**" এই আক্রমণের সাথে সাথে অবশ্য কোরান ও বিজ্ঞানের যোগসূত্র বের করার হার কমা শুরু করে না।

যাহোক, এমন ফতোয়া আসবে ধরে নিয়েই আসুন কিছু কোরান-হাদীস পর্যালোচনা করিঃ

১৮: ৮৬: পরে যখন তিনি সূর্য অস্ত যাবার স্থানে পৌঁছলেন, তিনি এটিকে দেখতে পেলেন কালো জলাশয়ে অস্তগমন করছে, আর তার কাছে পেলেন এক অধিবাসী। আমরা বললাম- "হে যুলক্বারনাইন, তোমরা শাস্তি দিতে পার অথবা এদের সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পার"।

১৮: ৯০: পরে যখন তিনি সূর্য উদয় হওয়ার জায়গায় পৌঁছলেন তখন তিনি এটিকে দেখতে পেলেন উদয় হচ্ছে এক অধিবাসীর উপরে যাদের জন্য আমরা এর থেকে কোন আবরণ বানাই নি।

এখানে কথক আল্লাহ যুলক্বারাইন সম্পর্কে জানাতে গিয়ে বলছেন, তিনি সূর্য উদয় স্থলে একবার গেলেন এবং আরেকবার গেলেন সূর্য অস্তের স্থানে। যেখানে গিয়ে যুলক্বারাইন দেখে সূর্যের কালো জলাশয়ে অস্ত যাওয়াও প্রত্যক্ষ করেন। এখান থেকে মনে প্রশ্ন আসে, তখন কি আরবের মানুষ জানতো না যে পৃথিবী গোলাকৃতির, কেননা, সমতল হলেই পৃথবীতে সূর্যের উদয় ও অস্ত যাওয়ার দুদিকে দুটি স্থানের প্রয়োজন পড়ে। (শানে নুযুল দ্রষ্টব্যঃ কাফিরেরা তাওরাত-ইঞ্জীলে উল্লেখিত আশ্চর্য মানুষ সম্পর্কে মুহম্মদ সা কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, যে ব্যক্তি গোটা বিশ্ব ভ্রমণ করেছিলেন উভয় দিকে মানে পশ্চিমে ও পূর্বে)।

এরপরে আরো কটি সুরায় কিছু আয়াত দেখলে একই প্রশ্ন আবারো উকিঝুকি মারতে থাকে মনে:

২১: ৩১: আর পৃথিবীতে আমরা পাহাড় পর্বত স্থাপন করেছি, পাছে তাদের সঙ্গে এটি আন্দোলিত হয়; আর ওতে আমরা বানিয়েছি চওড়া পথঘাট যেন তারা স□পথ প্রাপ্ত হয়।

২১: ৩২: আর আমরা আকাশকে করেছি এক সুরক্ষিত ছাদ। কিন্তু তারা এর নিদর্শনাবলী থেকে বিমুখ থাকে।

১৫: ১৯: আর পৃথিবী- আমরা তাকে প্রসারিত করেছি, আর তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা, আর তাতে উ□পন্ন করেছি হরেক রকমের জিনিস সুপরিমিতভাবে।

৭৮: ৬, ৭: আমরা কি পৃথিবীটাকে পাতানো বিছানো রূপে বানাইনি? আর পাহাড় পর্বতকে খুঁটি রূপে?
২: ২২: যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে ফরাশ (couch) বানিয়েছেন, আর আকাশকে চাঁদোয়া (canopy).....

৩১: ১০: তিনি মহাকাশমণ্ডলীকে সৃষ্টি করেছেন কোন খুঁটি ছাড়াই,- তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ; আর তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা পাছে এটি তোমাদের নিয়ে ঢলে পড়ে।

এসব যখন পড়ি, তখন আধুনিক বিজ্ঞান আকাশ সম্পর্কে কি বলে তা মনে আসলেই বিপদ। যখন মহাশূণ্যে নিয়ত গতিশীল জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর বিচরণের দিকে তাকাই তখন কোরানের এই আকাশমণ্ডলী যাকে খুটি ছাড়াই আল্লাহ মানুষের ছাদ বা চাঁদোয়া হিসাবে সৃষ্টি করেছেন, যার আবার ৭টি স্তরও বিদ্যমান, সম্পর্কে ধাধায় পড়ে যাই। আর, জমিন বা পৃথিবীকে পাতানো বিছানো হিসাবে তৈরী করে সেখানে পাহাড়-পর্বত দিয়েছেন, যার দরুন পৃথিবী হেলেও পড়ে না, নড়াচড়াও করতে পারে না। এ আল্লাহর অসীম দয়া নিসন্দেহে, কিন্তু এখন যখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, এত বড় বড় পর্বতমালা থাকার পরেও শুধু নড়াচড়া নয় প্রতি ২৪ ঘন্টায় এক ডিগবাজীর সাথে সাথে ৩৬৫ দিনে সূর্যের চারদিকে নেচে বেড়াচ্ছে এই পৃথিবী, তখন আল্লাহর জ্ঞানের পরিধি নিয়ে মন সন্দেহগ্রস্ত হয়ে উঠতে চায়!

এবারে নিচের আয়াত দেখিঃ

৩৬: ৪০: সূর্যের নিজের সাধ্য নেই চন্দ্রকে ধরার, রাতেরও নেই দিনকে অতিক্রম করার। আর সবকটিই কক্ষপথে ভাসছে।

এখানে সূর্য ও চন্দ্রের সংঘর্ষের সম্ভাবনা নেই বলে যখন ঘোষণা করা হয়, তখন হঠাতই মনে হয় সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন কক্ষপথের কথা জানলে কি এই সংঘর্ষের কথা উঠতে পারে? মনে পড়ে এক বালকের কথা, যে অবাক হয়ে তার বাবাকে প্রশ্ন করে যে, আচ্ছা বাবা- একই আকাশে সূর্যও পূর্ব থেকে পশ্চিমে যাচ্ছে, চন্দ্রও। তাহলে ওদের মধ্যে ঠোকাঠুকি হয় না কেন? বাবা বলতে পারেন, ভিন্ন কক্ষপথের কথা অথবা বলতে পারেন আল্লাহর কুদরতের কথা। আল্লাহ নিজে তো নিজের কুদরতের কথা ঘোষণা করবেনই।

সূর্য নিজ অক্ষে ঘুরছে দাবী করা হয়েছে যে আয়াতটি দিয়ে সেটি হলো ৩৬: ৩৮, সেটির PICKTHAL কর্তৃক অনুবাদ হচ্ছে: "And the sun runneth on unto a resting-place for him". এই রেস্টিং প্লেসের বিষয়টি আমরা এবার দেখি সহীহ বুখারী হাদীসেঃ

"হযরত আবু যর গিফারী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবী করিম সা. আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আবু যর, তুমি কি জান যে, অস্ত যাওয়ার পরে সূর্য কোথায় যায়?" আমি উত্তর করলাম, "আমি জানি না, একমাত্র আল্লাহর রাসুল সা. ই ভালো বলতে পারেন"। তখন তিনি বললেন, "অস্ত যাবার পরে সূর্য আল্লাহর আরশের নিচে অবস্থান করে এবং আবার পূর্বদিকে উদয় হওয়ার জন্য আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় থাকে। এমন দিন আসবে যখন সূর্য উদয়ের অনুমতি পাবে না এবং তখন পৃথিবীতে কেয়ামত নেমে আসবে'। (**ভলিউম ৪, বুক ৫৪, হাদীস** ৪২১)

এবারে মুহম্মদ সা. ও তাঁর সমসাময়িক আরববাসীদের বিজ্ঞানের দৌড় সম্পর্কে ধারণা করা আমাদের জন্য কিছুটা সহজ হলো বিধায়। মুহম্মদ সাঃ এর বিজ্ঞান দৌড়ই বা বলি কেমনে, ওনাকে তো শিখিয়েছেন আল্লাহ স্বয়ং!!

এমনতো অসংখ্যই আছে। ভুরি ভুরি। কোনটা বাদে কোনটা লিখবো? জ্বিন, ফেরেশতা এসব আর রূপকথার দেও-দানবের কোন পার্থক্য নেই। তার উপরে নদীর দুভাগ হওয়া, বোরাকে করে সপ্ত আসমান পরিভ্রমণ, লাঠির সর্প হয়ে যাওয়া, হাতের ইশারায় চাদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া, হাতের স্পর্শে কুষ্ঠরোগ ভালো হয়ে যাওয়া প্রভৃতি ঘটনাকে চিত্তাকর্ষক পৌরাণিক কাহিনী বলা যেতে পারে, যেখানে বিজ্ঞান না টানাই হয়তো সবার জন্য মঙ্গলজনক।

যে লাউ সে-ই কদুঃ

এবারে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের সাথে বিজ্ঞানের সংযোগ দেখি:

ভাগবত ২/১৬/১৭: হে মাতঃ হে স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা! আমি পূর্বেই বর্ণনা করিয়াছি যে, কাল হইতেছে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি, প্রকৃতির সাম্য, অব্যক্ত অবস্থা বিক্ষুব্ধ হওয়ার ফলে, যাঁহার থেকে সৃষ্টির শুরু হয়।

বিজ্ঞানঃ এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে প্রকৃতির সাম্য, অব্যক্ত অবস্থা বিক্ষুব্ধ হওয়ার ফলে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি শুরু হয়। বিক্ষুব্ধ শব্দটির অর্থ বিস্ফোরণ। বিজ্ঞানীরা বলছেন, একটি বৃহৎ বিস্ফোরণের ফলে মহাবিশ্বের শুরু হয়েছে। একে বিগব্যাঙ বলে।

ভাগবত ৩/২০/১৬: গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভী থেকে একটি সহস্র সূর্যের মতো উজ্জ্বল পদ্ম উদ্ভুত হয়েছিল। সেই পদ্মটি সমস্ত বদ্ধ জীবের অধিষ্ঠান স্বরূপ এবং প্রথম জীব সর্বশক্তিমান ব্রহ্মা সেই পদ্মটি থেকে আবির্ভুত হয়েছিলেন।

বিজ্ঞানঃ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বইটির মহাবিশ্বের উৎপত্তি এবং পরিণতি অধ্যায়ে (পৃ -১০০) আলোচনা করেছেন যে, মনে করা হয় বিস্ফোরণের সময় মহাবিশ্বের আয়তন ছিল শুণ্য, সুতরাং উত্তাপ ছিল অসীম। মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে তাপমাত্রা নেমে এসেছিল প্রায় এক হাজার কোটি ডিগ্রীতে। এ তাপ সূর্যের কেন্দ্রের তাপের চেয়ে প্রায় এক হাজার গুণ বেশী। ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে বিস্ফোরণের পর তাপমাত্রার পরিমাণ ১০০০ জ্বলন্ত সূর্যের তাপের সমান, যেটি বিজ্ঞানীরাও এখন আবিস্কার করেছেন।

স্কন্ধ পুরাণম ৩৮/৫৪: হে ভরত বংশাবতংস মেঘ সকল ধুম ও সমুদ্রের বাষ্প হইতে বৃষ্টি হয়। সেজন্য এরা জলপূর্ণ হলে নীল বর্ণ হয়ে থাকে এবং বর্ষণ করতে পারে।

ঋকবেদ ৭/৩৬/১: যজ্ঞের সদন হতে স্রোত্র প্রকৃষ্ট রুপে গমন করুক। সূর্য কিরণসমূহ দ্বারা বৃষ্টি সৃষ্টি করিয়াছেন।

বিজ্ঞানঃ আজকের বিজ্ঞানীরা বৃষ্টির কারণ হিসাবে যে পানিচক্রের কথা বলছেন, সেখানে এই সূর্যের তাপে প্রতিদিন সমুদ্র ও জলাশয়ের পানি বাষ্পীভুত হয়ে উপরে উঠে ঘনীভূত ও শীতলীভূত হয়ে মেঘে পরিণত হয়, যা ভারী হয়ে পরবর্তীতে বৃষ্টি হয়ে মাটিতে নেমে আসে। এটিই স্কন্ধ পুরাণ ও ঋকবেদের উপরের শ্লোকে বলা হয়েছে।

ভাগবত ২/৭/৩৭: কলিযুগে নাস্তিক অসুর স্বভাব মহাবিজ্ঞানীরা বৈদিক জ্ঞানে অত্যন্ত দক্ষ হয়ে মহাশূণ্য যানে চড়ে গগনমার্গে অদৃশ্যভাবে বিচরণ করবে....

বিজ্ঞানঃ এই শ্লোকে কলিযুগ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বানী করে বলা হয়েছে কলিযুগে বিজ্ঞানীরা বৈদিক জ্ঞান অর্জন করে বিমান বা মহাশূণ্যযান তৈরী করবে। কলিযুগ মানে বর্তমান যুগ। সুতরাং বলা যায় বর্তমান যুগে বিজ্ঞানীরা যে বিমান তৈরী করেছেন, সে সম্পর্কে ভাগবতে লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে ভবিষ্যদ্বানী করা হয়েছে। ভাগবতে বেশ কয়েক রকমের মহাশূণ্য যানের বর্ণনা আছে।

এমন অনেক নমুনা দেখানো যেতে পারে, বাইবেলের বিজ্ঞানিকীকরণ নিয়েও কিছু নমুনা দেয়া যেতে পারে। মুসলিম পাঠকের কাছে এখানকার আলোচনাগুলো হাস্যকর, অবৈজ্ঞানিক, অবান্তর, অযৌক্তিক খুব সহজেই মনে হতে পারে; কিন্তু আদতে কোরানের সাথে বিজ্ঞানের যোগসূত্র বের করার আলোচনার সাথে এই আলোচনাসমূহের কোন পার্থক্য নেই। যে লাউ সে-ই কদু, এখানেও হয়েছে অনুবাদ ও ব্যাখ্যাগত বিচ্যুতি, আজকের বিজ্ঞান এসব কিচ্ছা-কাহিনীকে আর যাই হোক বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকার করে না। আরেকটি তুলনামূলক নমুনা দেখিয়ে এ পরিচ্ছেদের আলোচনা শেষ করছি।

কোরান ২৩:১৩,১৪: তারপর আমরা তাকে বানাই শুক্রকীট এক নিরাপদ অবস্থান স্থলে। তারপর শুক্রকীটকে বানাই একটি রক্তপিণ্ড, তারপর রক্তপিণ্ডকে বানাই একতাল মাংসের তাল, তারপরে মাংসের তালে আমরা সৃষ্টি করি হাড়গোড়, তারপর হাড়গোড়কে ঢেকে দেই মাংসপেশী দিয়ে, তারপরে আমরা তাকে সৃষ্টি করি অন্য এক সৃষ্টিতে। সেইজন্য আল্লাহরই অপার মহিমা, কত শ্রেষ্ঠ এই স্রষ্টা।

বিজ্ঞানঃ সেই কোন আমলে কোরানেই মাতৃগর্ভে ভ্রূণ সৃষ্টি ভ্রূণ থেকে ধীরে মানব শিশুর আকৃতি লাভের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে।

বায়ুপুরাণম ১৪/১৮, ১৯: গর্ভকালে শুক্র এবং শোনিত মিলিত হয়ে কলল আকার ধারণ করে। পরে কলল থেকে বুদবুদ আকার প্রাপ্ত হয়। চক্রের উপর মাটির পিণ্ড যেমন চক্রের ঘুর্ণন দ্বারা বিবর্তিত হয়ে ঘট, শরাদি বিভিন্ন নানাকার ধারণ করে, তদ্রূপ আত্মাও বায়ুদ্বারা পরিচালিত হয়ে কালবশে অস্থিযুক্ত বিবিধ মনঃসম্পন্ন মানুষরূপে উৎপন্ন করে।

ভাগবত ৩/৩১/২: সেই রেতকণা গর্ভে পতিত হলে, একরাত্রে শোনিতের সাথে মিশ্রিত হয়, পঞ্চ রাত্রিতে বুদ্বুদের আকার প্রাপ্ত হয় এবং ধীরে ধীরে তা মাংসপিণ্ডে বা অণ্ডে পরিণত হয়।

বিজ্ঞানঃ বৈদিক সাহিত্যে শুক্রাণুকে রেতকণা বা শুক্র, ডিম্বাণুকে শোনিত এবং জাইগোটকে কলল নামে অভিহিত করা হয়। আধুনিক বিজ্ঞান আজ অনুরূপ কথাই বলে।

উভয় আলোচনাই আধুনিক বিজ্ঞানকে টেনে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরার চেষ্টা করলেও, আধুনিক ভ্রূণতত্ত্ব অনুসারে অবশ্য কোরান বা ভাগবত ও বায়ুপুরাণের এসব ব্যখ্যা সম্পূর্ণ ভুল প্রমানিত!!

১৪০০ বছর আগের এক নিরক্ষরের গল্পঃ

এই ধরণের বিজ্ঞান আলোচনার পরে সকলের উদ্দেশ্যে প্রায়শই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছুড়ে দেয়া হয়ঃ "আজ হতে ১৪০০ বছর আগে যে আরবে একজন নিরক্ষর মানুষ এই কথাগুলো কিভাবে ভাবতে পেরেছিলেন তা কি কখনো চিন্তা করেছেন? আজ বিজ্ঞান যা আবিষ্কার করছে আজ হতে ১৪০০ বছর আগেই একজন মানুষ তা বললে তা কিভাবে তার মস্তিষ্ক প্রসূত হয়?" এভাবেই প্রমাণ হয়ে গেল কোরান মনুষ্য সৃষ্ট নয়, এটা ঐশী। এখানেই গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটলে ভালো হতো, কিন্তু যখন আমরা মানব ইতিহাসের কিছু দারুণ কিছু কর্মের সন্ধান পাই তখন বিস্ময়াভূত হয়ে যাই। সেই ১৪০০ বছরেরও আরো প্রায় ২ শতাধিক বছর পূর্বেই (কোপারনিকাসেরও সহস্র বছর পূর্বে) আর্যভট্ট (৪৭৬ খৃস্টাব্দ) বলেছেন, পৃথিবী গোলাকার, এটি নিজ অক্ষের চারদিকে ঘুরে এবং সাথে সাথে এটি সূর্যকেও প্রদক্ষিণ করে। ২ সহস্রাধিক বছর আগে (খৃষ্টের জন্মেরও ৩০০/ ৩৫০ বছর পূর্বে) এরিস্টোটল বলেছেন, বায়ুশূণ্য অবস্থায় বস্তু একই অবস্থানে থাকবে নতুবা সমগতিতে চিরকাল চলতে থাকবে। (এরিস্টোটল অবশ্য তার সিদ্ধান্তের পেছনে কোন প্রমাণ তো হাজির করতে পারেনই নি, বরং পরক্ষণেই তার সেই আবিস্কারকে অস্বীকার করেছেন এই ধারণা থেকে যে, বায়ুশূণ্য স্থান থাকতে পারে না, ফলে এটি অসম্ভব)। ভাস্করাচার্য (২), নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র প্রদানেরও ৫ শতাধিক বছর পূর্বে বলেছেন, পৃথবীতে বস্তুসমূহ পতিত হয় পৃথিবীর টানেই, এবং পৃথিবী, গ্রহসমূহ, জ্যোতিস্কসমূহ, চাঁদ ও সূর্য নিজ নিজ কক্ষে এই আকর্ষণের কারণেই অবস্থান করে। মুহম্মদের বহু আগে গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরাস অনু, পরমানু, জড়তার সূত্র, জলচক্র, ভুমিকম্প, চুম্বকত্ব সহ আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক কিছুই সঠিক ভাবে অনুধাবণ এবং ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন।

এসব যখন দেখি তখন ভাবি, আল্লাহর পূর্বে মানুষই তো সঠিক জ্ঞান তো আমাদের দিতে পারলো। আর, আল্লাহ এমনভাবে পেচিয়ে পুচিয়ে যে জ্ঞান দিলেন, তাও দেখা যাচ্ছে অনেক জায়গায় ভুলে ভরা!! আফসোস তৈরী হয়, নিজ হাতে লেখার পরেও কেন আল্লাহ গোটা কোরানে একবারো সরাসরি উল্লেখ করতে পারলেন না যে, পৃথিবী গোলাকার, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে।

সূত্রঃ

১। আল কুরআন- বাংলা অনুবাদ, ডঃ জহুরুল হক
২। Translation of quran(http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/)
৩। তাফসিরুল মারেফুল কোরআন (http://www.banglakitab.com/quran.htm)
৪। সৈয়দ কামরান মির্জা কর্তৃক প্রণীত Samples of Quranic Contradictions, Inconsistencies and Errors (http://www.faithfreedom.org/Articles/SKM/contradictions.htm)
৫। কোরআন বাইবেল বেদ ও বিজ্ঞান- ডাঃ সি এন সি বোস

৬। Richard Carrier, Predicting Modern Science: Epicurus vs. Mohammed, http://secweb.infidels.org/?kiosk=articles&id=362

নাস্তিকের ধর্মকথা, বাংলাদেশ থেকে লেখন। ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে তিনি আন্তর্জালে লিখে থাকেন। nastikerdharmakatha.blogspot.com নামে নিজস্ব ব্লগ আছে তার। ইমেইল - nastikerdharmakatha@gmail.com